মহাত্মা গান্ধী এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ - একটি আন্তঃসম্পর্ক

সুপ্রিয় মুন্সী

ভারতের স্বাধীনতা ও স্বদেশী আন্দোলনের জাগ্রত আত্মা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মহাপ্রয়াণ ১৯২৫ সালের ১৬ই জুন। স্বাধীনতা আন্দোলন ও স্বদেশ পুনর্গঠনের ঋত্বিক ও মুখ্য সেনাপতি মহাত্মা গান্ধী তাঁর সম্পাদিত 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকার ১৮ই জুন, ১৯২৫, সংখ্যায় লিখলেন - "When the heart feels a deep cut, the pen refuses to move. I am too much in the centre of grief to be able to send much for readers of Young India across the wire. India has lost a jewel. But we must regain it by gaining Swaraj" - "হৃদয়ে যখন গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয় তখন কলম সরতে চায়না। আমি এখন গভীর শোকে আচ্ছন্ন। 'ইয়ং ইন্ডিয়া' র পাঠকদের তার মারফৎ এর বেশী আর জানাতে পারছিনা। ভারতবর্ষ এক জন রত্নকে হারিয়েছে। স্বরাজ লাভ করে আমরা তা' পুনরুদ্ধার করব।"

ঐদিন, ১৮ই জুন, ১৯২৫, মহাত্মাজী দেশবন্ধুর প্রয়াণের সংবাদ পেয়ে পূর্ব্ববঙ্গ সফর পরিত্যাগ করে সকালবেলাই শিয়ালদহ স্টেশন পৌছলেন এবং সেখান থেকে দেশবন্ধুর নশ্বর দেহ বহন করে দক্ষিণ কলকাতায় অবস্থিত কেওড়াতলা মহাশ্মশানে পৌছলেন। পূর্বাঞ্চলীয় গান্ধী মিউজিয়ামে (বারাকপুর) সংরক্ষিত ও প্রদর্শিত রয়েছে ঐ দিনই কেওড়াতলা মহাশ্মশানে মিশ্রধাতুতে তৈরী প্রখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় ভাস্কর প্রকাশ কারমারকারের বিশ্ববিখ্যাত সৃষ্টি মহাত্মা গান্ধীর একটি আবক্ষ মূর্ত্তি। মূর্ত্তিটির বিপন্ন, চিন্তাক্লিষ্ট মুখচ্ছবি ও অভিব্যক্তি গান্ধীজীর তদানিন্তন মানসিক পরিস্থিতিকে ভারী সুন্দরভাবে মূর্ত্ত করেছে। ঘনিষ্ঠ, শ্রদ্ধেয় সহকর্ম্মীর অকালমৃত্যু তাঁকে গভীরভাবে আঘাত করেছে। এর ফলে স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা আর পূরণ করা যাবে কিনা সেই চিন্তায় মগ্ন বেদনাহত গান্ধীজীর অনুভূতির বা অনুভবের বহিঃপ্রকাশই পূর্ব্বোল্লিখিত ইয়ং ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত প্রতিবেদনটি।

ইয়ং ইন্ডিয়ার পরবর্ত্তী সংখ্যা ২৫শে জুন, ১৯২৫ - এ প্রকাশিত সম্পাদকীয়টি একই অনুভবের বহিঃপ্রকাশ - "পুরুষোত্তম চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন। বঙ্গদেশ আজ বিধবার মত। তাঁর শূন্য স্থান পূরণের জন্য মানুষ আমাদের দেশে আর নেই। যদি আমি বলতে পারতুম কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের আসনে কে বসতে পারবেন তাহলে দেশবন্ধুর স্থানে নেতা হিসাবে কে দাঁড়াতে পারবেন তা বলতে পারতুম। তিনি শত যুদ্ধের বিজয়ী বীর ছিলেন। তিনি চিরজীবি হন।"

এই প্রসঙ্গে আমরা ১৯শে জুন, ১৯২৫, সংখ্যায় 'ফরোয়ার্ড' কাগজটিতে দেখতে পারি। সম্ভবতঃ ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের পরে পাঞ্জাব তদন্ত কমিটীর কাজ শুরু হবার সময়েই গান্ধীজী ও দেশবন্ধুর সরাসরি প্রথম সাক্ষাৎকার। সেই সময় থেকেই গান্ধীজী দেশবন্ধুকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। সেই তুলনায় মহাত্মাজী সম্বন্ধে দেশবন্ধুর প্রশংসাসূচক অভিব্যক্তি যথেষ্ট কম। সম্ভবতঃ তাঁর সহকর্ম্মী হলেও দেশবন্ধু গান্ধীজীকে তাঁর গুরুর স্থানে বসিয়েছিলেন, পরম্পরাগতভাবে শিষ্য গুরুকে প্রগাঢ় ভক্তি করেন, তাঁর উপদেশ শিরোধার্য করে সর্ব্বশক্তি দিয়ে তাঁর পথ অনুসরণ করার চেষ্টা করেন, যা আমরা ১৯১৯ সাল থেকে চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতা ও কার্যক্রমের মধ্যে প্রকাশিত হতে দেখি। এই প্রসঙ্গে সুধাকৃষ্ণ বাগচী প্রণীত 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন' গ্রন্থের ১৭৪ পৃঃ, ইত্যাদি দেখতে পারি - 'গান্ধী শিষ্য চিত্তরঞ্জন' (১৯১৯)। দেশবন্ধুর আইন ব্যবসা পরিত্যাগ গান্ধীর অনুরোধে তা আমরা অনেকের লেখা থেকেই জানতে পারি, যেমন রবিদাস সাহা রায় প্রণীত 'আমাদের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন', পৃঃ ১৩৭ দেখা যেতে পারে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বইটিতে লেখক মধুসূদন দেব মর্ম্মস্পর্শী বিবরণে এর আর একটি চিত্র গভীর তাৎপর্যপূর্ণভাবে তুলে ধরেছেন - "........... মহাত্মা গান্ধীর সেই আহ্বান চিত্তরঞ্জনের প্রাণে এক নূতন সাড়া জাগালো। তিনি যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখতে পেলেন - একদিন যাঁর জন্যে অপেক্ষা করে আছেন, তাঁর সেই নেতা, সেই গুরু এসে তাঁকে ডাকলেন, পথের সন্ধান দিলেন। ছুটে বেরিয়ে গেলেন চিত্তরঞ্জন দেশের কাজে - দেশের ডাকে।"...........

মহাত্মা গান্ধীর কাছে গিয়ে তিনি বললেন - "আমি এসেছি। আমাকে আপনি সঙ্গে নিন।"

মহাত্মা গান্ধী দুই হাত প্রসারিত করে কাছে টেনে নিলেন চিত্তরঞ্জনকে। দুই মহাশক্তির মিলন হল। আগুনের সঙ্গে মিলল বাতাস। এই বর্ণনা যে অত্যুক্তি নয় তা আমরা দেখতে পারি দেশবন্ধুর জীবনের শেষবেলায় দার্জিলিঙে মহাত্মা ও দেশবন্ধুর পরস্পরের মিলনে আনন্দ, উচ্ছাস ও কথোপকথনের প্রকাশে (দ্রষ্টব্য

- হেনা চৌধুরী কৃত 'দেশবন্ধুর জীবন বেদ' - পৃঃ ২৩৩-২৩৮)। দেশবন্ধুর সুযোগ্যা সহধর্ম্মিনী ও সহকর্ম্মিনী পরমশ্রদ্ধেয়া বাসন্তী দেবীর গান্ধীজী সম্বন্ধে স্মৃতিকথা গান্ধী মিউজিয়ামের (বারাকপুর) সংগ্রহে সংরক্ষিত আছে। ১৯৬৪ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী এটি গৃহীত হয়। বাসন্তীদেবীর বয়স তখন ৮৪ বছর। তিনি গান্ধীজীর কথা বলতে গিয়ে হেসে সারা হয়েছেন - গান্ধীজী তাঁকে 'Sister' বা ভগিনী বলতেন বলে জানিয়েছেন আর বলেছেন তাঁর ও দেশবন্ধুর উভয়েরই মহাত্মা ছিলেন 'elder brother' বা বড় ভাই।

মিলনের এই চিত্রটিই অবশ্য মূল নয়, বিরোধও ছিল। সেটি স্বাভাবিক, কারণ দুজনেই স্বাধীনচেতা, ইনটেলেকচুয়াল। কোন বিষয়কে নিজের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখা বা পরিস্থিতির পাঠ ভিন্নরকম হতেই পারে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে হয়েছেও এবং সম্ভবতঃ কেবল ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 'চৌরিচরা'র ঘটনা ছাড়া সবসময়েই দেশবন্ধু গান্ধীজীর মত মেনে নিয়েছেন বা গান্ধীজীর মতে মত প্রকাশ করেছেন, তা গোপীনাথ সাহার ক্ষেত্রেই হোক, বা অসহযোগের ক্ষেত্রেই হোক বা 'কাউন্সিল্ প্রবেশ' এর ক্ষেত্রেই হোক। লর্ড বার্কেনহেডের বিষয়ে দেশবন্ধুর অতিরিক্ত আশাকে গান্ধীজী সমর্থনই করেননি ঠিকই, কিন্তু পাছে দেশবন্ধু মনে কষ্ট পান তা সরাসরি প্রকাশ করেননি। অবশ্য বারকেনহেড্ দেশবন্ধুকে নিরাশ করেছিলেন এবং দেশবন্ধুর অকাল মৃত্যুর এটি একটি কারণও বটে। গান্ধীজীর সঙ্গে দেশবন্ধুর মত-বিরোধের ক্ষেত্রে যে কয়টি বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হয়েছে তা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে এবং শেষ পর্যায়ে সেগুলি মিটে গিয়েছিল কিনা তাও পর্যালোচিত হতে পারে।

১৯২৪ সালের ১২ই জানুয়ারী স্যার চালর্স টেগার্টকে হত্যা করতে গিয়ে গোপীনাথ সাহা আর্নেস্ট ডেকে গুলি করে মেরে ফেলেন এবং বিচারে তাঁর ফাঁসীর হুকুম হয় এবং ১৯২৪ সালের ১লা মার্চ তা কার্যকর হয়। গোপীনাথ সাহাকে রক্ষা করার বিষয়ে জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যেই বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এই বিষয়ে দেশবন্ধুর অবস্থান আমরা লক্ষ্য করতে পারি - "মহাত্মার প্রস্তাব ও আমদের প্রস্তাবে মূলতঃ কোন পার্থক্য ছিল না। তিনিও গোপীনাথের আত্মোৎসর্গের প্রশংসা করিয়াছেন, আমরাও করিয়াছি। তিনি তাহার কার্য বিপথচালিত মনে করেন, আমরাও তাই করি।" দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণের পর মহাত্মাজী অনেকবার বলিয়াছেন - "গোপীনাথ প্রস্তাব সম্বন্ধে আমাদের বিরোধ প্রেমিকের কলহ মাত্র।" (দ্রষ্টব্য - দেশবন্ধু স্মৃতি, হেমেন্দ্র দাশগুপত, পৃঃ ২৭৩)।

মহাত্মা গান্ধী নির্দেশিত ভারতবর্ষীয় স্বাধীনতা আন্দোলন মূলতঃ চারটি (৪) অধ্যায়ে বিস্তৃত ছিল - অহিংস অসহযোগ আন্দোলন - ১৯২০-২২, লবণ আন্দোলন - ১৯৩০-৩১, আইন অমাণ্য আন্দোলন -

১৯২২-২৪ এবং 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন - ১৯৪২-৪৫। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে দেশবন্ধু জীবিত ছিলেন ও এই বিষয়ে শুরুতে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর মতদ্বৈধ দেখা দেয়। ১৯২০ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন সংঘটিত হয় এবং গান্ধীজী বিদেশী সরকারের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার অসহযোগিতার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। দেশবন্ধু এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তাঁর প্রধান যুক্তি ছিল যে দেশবাসীকে সম্পূর্ণভাবে তৈরী করার জন্যে অন্ততঃ পাঁচ (৫) বছর সময় দিতে হবে। কিন্তু পরবর্ত্তী কংগ্রেস অধিবেশনে, অর্থাৎ নাগপুরে তিনি নিজেই গান্ধীজীকে সমর্থন করেন এবং ক্রমশঃ একজন প্রকৃত অসহযোগী হয়ে ওঠেন। কারান্তরালে থাকার জন্যে আমেদাবাদ কংগ্রেসে তাঁর লিখিত ভাষণের অংশবিশেষ এই প্রসঙ্গে আমরা বিবেচনা করতে পারি - "আমাদের পক্ষে অসহযোগ ব্যতীত যুদ্ধের অন্য কোন উপায় নাই এবং কংগ্রেসের দুইটি অধিবেশনে আমরা অসহযোগই উপায় জ্ঞানে অবলম্বন করিয়াছি। আমরা অসহযোগী ; সুতরাং আপনাদের কাছে ইহার স্বরূপ আলোচনার প্রয়োজন নাই। মিস্টার স্টোক্স্ বলেন প্রতিষেধ সাধ্য অন্যায়ে সম্মত হইতে অস্বীকার করাই অসহযোগ। অবিচার গ্রহণ করিতে অস্বীকার করা, প্রতিকার সাধ্য অনাচারে অসম্মত হওয়া, যাহা ন্যায়ের বিরোধী তাহার বিরুদ্ধে দন্ডায়মান হওয়া, এবং যাহারা অনাচার করে, তাহাদের সঙ্গে কার্য করিতে অস্বীকার করা - ইহাই অসহযোগ।" কেবল ভাবের বা নীতির সাযুজ্য নয়, ভাষার প্রশ্নেও গান্ধীজীর কত নিকটে এসেছিলেন দেশবন্ধু তা আমরা এই অভিভাষণে উপলব্ধি করতে পারি।

১৯২২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী গান্ধীজী স্বয়ং অসহযোগ আন্দোলনে ব্রতী হন। কিন্তু কয়েকদিন পরেই উত্তরপ্রদেশের চৌরিচৌরার গ্রামবাসীরা কয়েকজন পুলিশ কর্ম্মীকে থানার মধ্যে পুড়িয়ে মারে। গান্ধীজী সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলন প্রত্যাহার করেন, কারণ তিনি বুঝতে পারেন যে অহিংস অসহযোগনীতিতে ভারতবাসী পুরোপুরি বিশ্বাসী হতে পারেনি। দেশবন্ধু ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ গান্ধীজীর এই পদক্ষেপ মেনে নিতে পারেননি, কারণ আন্দোলন যথেষ্ট গতিময় হয়ে উঠেছিল এবং বিদেশী শাসক চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর 'Indian Struggle' পুস্তকের ৭৩-৭৪ পৃষ্ঠায় দেশবন্ধুর এই সময়ের মানসিকতা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। দুজনে তখন একই কারাগারে বন্দী ছিলেন - "I was with Deshbandhu at the time and I would see he was beside himself with anger and sorrow........" "(আমি সেই সময়ে দেশবন্ধুর সঙ্গেই ছিলাম এবং দেখতে পাচ্ছিলাম রাগে ও দুঃখে তিনি প্রায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলেন.........)"। আসলে গান্ধীজীর

চিন্তা ছিল সুদূর প্রসারী - এক সর্ব্বপ্রকারে স্বাধীন অহিংস ভারতবর্ষ প্রতিষ্ঠা যা বিশ্বের কাছে আদর্শস্বরূপ ও অনুসরণযোগ্য হবে। তাৎক্ষণিক কোন লাভের প্রশ্ন সেখানে ছিল না। তাই দেশবন্ধু, লালা লাজপৎ রায়, পঃ মতিলাল নেহেরু সহ অনেকেই গান্ধীজীর এই পদক্ষেপকে সমর্থন করতে পারেননি।

সম্ভবতঃ কারান্তরালে থাকার সময়েই দেশবন্ধু স্বাধীনতা সংগ্রামী ও দেশবাসীদের সামনে কাউন্সিল্ প্রবেশ আন্দোলনের চিন্তা করেন - বাইরে অহিংস আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে কাউন্সিলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তার কার্য বাধা দান করে দুইদিক থেকে বিদেশী সরকারকে আঘাত করাই এর মূল উদ্দেশ্য ছিল - "What are these Councils and what are these legislations? Things of falsehood. Must we not remove them. Mahatma Gandhi intends to wreck the reforms and I do the same thing by working from within, and the only way to do it is to make Government through Councils in possible" - Deshbandhu C. R. Das in the Delhi Session of the Congress, September, 1923 (History of the Indian National Congress - Dr. P. Sitaramayya) - গান্ধীজী অহিংস আন্দোলনের মধ্যে নীতির প্রশ্নে প্রথমে তা মেনে নেননি এবং এটিকে কার্যকর করার জন্যে কংগ্রেসের মধ্যেই স্বরাজ্য দল গঠিত হয় এবং ফলে কংগ্রেসের মধ্যেই একটি বিভাজন দেখা দেয়। গান্ধীজীর স্বপক্ষীয়রা 'নো-চেঞ্জার' হিসাবে পরিচিত হন ও যাঁরা কাউন্সিল প্রবেশকে সমর্থন করেন তাঁরা 'প্রো-চেঞ্জার' বলে পরিচিত হন। অবশ্য পরবর্তী পর্যায়ে বিশেষ করে 'গান্ধী - দাশ প্যাকট্' -এর মারফতে কাউন্সিল্ প্রবেশ কংগ্রেসের অন্যতম কার্যক্রম হয়ে ওঠে এবং ১৯২৩ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর কংগ্রেসের দিল্লী অধিবেশনে এটি গৃহীত হয়। তবে গঠনমূলক কার্যক্রম ও কাউন্সিল্ প্রবেশ দুইই একই সঙ্গে চলবে তা স্থির হয়।

শেকস্‌পীয়ার রচিত 'জুলিয়াস সীজার' নাটকে মার্ক এন্টনী তাঁর 'Funeral speech' - এ বলেছিলেন যে মানুষ খারাপটাকেই মনে রাখে - 'The Good is often intered with the bones' - ভালোটা প্রায়ই দেহের সঙ্গে সমাধিস্থ করা হয়। আমরা বিরোধটাকেই মনে রাখি, চর্চ্চা করি। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যেমন গান্ধীজীর সম্পর্কের এই দিকটাই আমরা মনে রাখি, কিন্তু অন্তরের অন্তস্থলে ফল্গু ধারার মত যে মিলন নিহীত ছিল তার খবর রাখি কই? দেশবন্ধু-মহাত্মা সম্পর্কটিও তাই। দেশবন্ধুর অকালমৃত্যু গান্ধীজীকে প্রচন্ড নাড়া দিয়েছিল, হতবাক করে দিয়েছিল। তিনি লিখেছেন - "লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে আমি নিঃসঙ্গ,

দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিলাম, এমন কি আজও তার আঘাত সামলাতে পারিনি। কিন্তু দেশবন্ধুর তিরোধানে আমার অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে.......। একথা লিখতে গর্বে আজ আমার হৃদয় ভরে উঠছে যে আমার সহযোগীদের মধ্যে চিত্তরঞ্জন দাশের চেয়ে বেশি প্রাণ খুলে আমাকে কেউই মেনে নিতে পারেননি........।" (দ্রষ্টব্য : মণি বাগ্‌চি - 'দেশবন্ধু')

এই প্রসঙ্গে আমরা ১৯২৫ সালের ২রা ও ৩রা মে তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলার প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের ফরিদপুর (বর্তমানে বাংলাদেশে) অধিবেশনের একটি ঘটনা উল্লেখ করতে পারি যেখানে গান্ধীজী দেশবন্ধু সম্পর্ক এক উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছে।

ফরিদপুরের এই অধিবেশন বাংলা ও ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। ভারতের বহু দেশপূজ্য নেতা সভায় যোগদান করেছিলেন। বিষয় নির্বাচনী সভা ২রা মে সন্ধ্যায় সংঘটিত হল। কিন্তু দেশবন্ধুর সঙ্গে অন্যান্য সদস্যদের মতবিরোধ দেখা দিল। ক্ষোভে, দুঃখে দেশবন্ধু সভাপতিত্ব পদ পরিত্যাগের কথা জানালেন। পরে পরের দিন সকালে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল এবং দেশবন্ধুর মুখের পরিস্থিতি দেখে গান্ধীজী দুঃখ অনুভব করলেন এবং তাঁর পৃষ্ঠদেশে হাত রেখে সহানুভূতির সঙ্গে প্রশ্ন করলেন - "দাশ, আপনাকে খুব ব্যথিত বলে মনে হচ্ছে। কারণটি কি বলুন তো?"

দেশবন্ধু উত্তরে বললেন - "মহাত্মাজী, আমার জীবনের উচ্চাকাঙ্খা নির্মূল হয়েছে। আপনি জানেন যে আমরা 'কাউন্সিল্ এন্ট্রি' র কথা বলেছিলাম এই জন্যে যে যাতে ভেতর ও বাহির দুই দিক দিয়েই আমরা ব্রিটীশদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারি যাতে তারা শাসন সংস্কারে বাধ্য হয়। ভারত-সচিব লর্ড বার্কেনহেড্ আমাদের কাছে প্রস্তাব করেছেন যে আমরা যদি এই দ্বৈত-শক্তি ত্যাগ করি তবে ব্রিটীশ সরকার কিছু সংস্কারের ব্যবস্থা করতে পারে। সেইজন্যে এই সম্মেলনের বিষয় - নির্বাচনী সভায় আমি প্রস্তাব করেছিলাম যে সভা ব্রিটীশের সঙ্গে সম্মানজনক সহযোগিতা প্রস্তাব গ্রহণ করুক। কিন্তু সভায় এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।" এটি শুনে গান্ধীজী দেশবন্ধুকে বললেন - "দাশ, আপনি শান্ত হোন। আমি চেষ্টা করছি যাতে আপনার প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়।"

এরপর গান্ধীজী বিষয় - নির্বাচনী সভার সব সভ্যকে আহ্বান করে নিম্নলিখিত আলোচনা করলেন - 'আপনাদিগকে কয়েকটি প্রশ্ন করিব। শুধু 'হ্যাঁ' বা 'না' উত্তর চাই, কোন যুক্তি আমি শুনিব না। আমার প্রথম

প্রশ্ন - আপনারা কি বুঝিতে পারেন যে আপনারা দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিক এবং আপনারা এইক্ষণ যুদ্ধক্ষেত্রেই আছেন।

বলুন - 'হ্যাঁ' বা 'না'

সকলেই বলিলেন - 'হ্যাঁ'

আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন : আপনারা কি স্বীকার করেন যে এই যুদ্ধে বাংলাদেশে সর্বাধিনায়ক হইতেছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

বলুন - 'হ্যাঁ' বা 'না'

সকলেই বলিলেন - 'হ্যাঁ'

আমার তৃতীয় প্রশ্ন : আপনারা কি স্বীকার করেন যে সৈনিক যতক্ষণ যুদ্ধক্ষেত্রে ততক্ষণ সর্বধিনায়কের আদেশ পালন করা তাহার পক্ষে একান্ত কর্তব্য।

বলুন - 'হ্যাঁ' বা 'না'

সকলেই বলিলেন - 'হ্যাঁ'

এইক্ষণ আমি আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে আপনারা ১২ ঘটিকার পূর্বে বিষয় নির্বাচনী সভায় উপস্থিত হইয়া দেশবন্ধুর উত্থাপিত প্রস্তাব গ্রহণ করুন। আমি আরও বলিতেছি যে যদি আপনারা ঐরূপ কার্য্য না করেন, তবে আমি আজ সম্মিলনীর সভায় সভাপতিত্ব করিয়া সভা দ্বারা উহা গ্রহণ করাইব।'

এরপরে সভ্যগণ দেশবন্ধুর প্রস্তাব গ্রহণ করেন। দুর্ভগ্যক্রমে দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে ব্রিটিশ সরকার সংস্কারের প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করে।

বস্তুত দেশবন্ধুর সাহস ও মহান আত্মত্যাগ মহাত্মা গান্ধীকে প্রভূতভাবে অভিভূত করেছিল এবং বোধ হয় দেশবন্ধু মহাত্মাজীর কাছে সেইরূপই ছিলেন যেমন স্বামীজী ছিলেন শ্রী রামকৃষ্ণের কাছে।

মহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ চিরকালই ভারতীয় ইটিহাসে মহামানবরূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবেন। দুজনেই মানবতাবাদী এবং মানবিক মূল্যবোধগুলির মূর্ত্ত প্রতীক ছিলেন, আদর্শের জন্য উভয়েই নিজেদের নিঃশেষিত করেছেন, চরম আত্মত্যাগেও পিছ্পা হননি। দর্শনগতভাবে উভয়েই ছিলেন Altruist বা পরার্থবাদীন - 'পরের কারণে' নিজেদের স্বার্থ বলি দিয়েছেন - স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, কোন কিছুর দ্বারাই বাধাপ্রাপ্ত

হননি। অবশ্য কি কস্তুর বা' গান্ধী, কি বাসন্তী দেবী বা সন্তান-সন্ততিরাও তা মেনে নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। পরবর্তী পর্যায়ে মহাত্মার জ্যেষ্ঠপুত্র পিতাকে ভুল বুঝে বিপথচালিত হয়েছেন ঠিকই, পিতামাতাকে মানসিক আঘাতে জর্জরিত করেছেন এটিও ঠিক, কিন্তু নিজ আদর্শকে অটুট রেখে স্থিরীকৃত কর্ত্তব্য সমাপণে গান্ধীজীর কাছে তিলমাত্র বাধা হতে পারেননি। আজকের এই ভোগসর্ব্বস্ব, স্বার্থান্বেষী, শোষণকামী ও শোষণকারী অশান্ত জীবনে তাঁরা উভয়েই আমাদের পরিত্রাতারূপে আবার অবতীর্ণ হোন অর্থাৎ তাঁদের মহৎ জীবন ও আদর্শ আমাদের উদ্বুদ্ধ করুক, সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা থেকে আমাদের মুক্ত করুক এটিই প্রার্থনা।

<u>গ্রন্থপঞ্জী :</u>

১) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন - মধুসূদন দেব

২) আমাদের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন - রবিদাস সাহা রায়

৩) দেশবন্ধু - মণি বাগ্চি

৪) দেশবন্ধু স্মৃতি - দিলদার সম্পাদিত

৫) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন - সুধাকৃষ্ণ বাগ্চি

৬) দেশবন্ধু স্মৃতি - হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

৭) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবন বেদ - হেনা চৌধুরী